অধ্যায় - ৩

মৃৎশিল্প:

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ নিম্ন এবং উর্বরা। পলিমাটি-কাদামাটির দেশ আমাদের মাতৃভূমি। এই মাটিই মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান। মাটি শুকিয়ে পুড়িয়ে শিল্প সৃষ্টি হয়। মাটির শিল্প, মৃৎশিল্প। এই শিল্পে জড়িয়ে আছে ঐতিহ্য। মাটির সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয়। আর এই মাটির শিল্প বাংলা ও বাঙালির একান্ত আপনার শিল্প। বাঙালির গৃহকোণকে আলোকিত করে এই মাটির শিল্প। আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজন-সৌন্দর্যের মেলবন্ধন ঘটেছে বাংলার অপরূপ এই শিল্পকলায়। আমাদের দৈনন্দিন ঘর গৃহস্থালী নানা উপকরণ মাটির তৈরি। বাঙালির আচার, অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতি-নীতি, মঙ্গলসূচক শুভ কর্ম জড়িয়ে রয়েছে বাংলার নিজস্ব এই শিল্পকলায়। এককথায়, বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সারাৎসার মৃৎশিল্প। কালজয়ী এই শিল্পের স্রষ্টারা হলেন কুমোর। কুমোরেরা মাটির তৈজসপত্র তৈরি করেন। তৈরি করেন হাঁড়ি, কলসী ও বিভিন্ন গৃহস্থালী আসবাব। এছাড়াও মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি করেন এদেরই এক সম্প্রদায়। আর আছেন পটিদারেরা। পটিদারেরা মাটির প্রতিমা তৈরি করেন। এছাড়া ভিন্ন এক শ্রেণীর শিল্প শ্রমিকেরা তৈরি করেন ইট। কাঁচা ইট পুড়িয়ে ঘরবাড়ী, প্রাচীর, মন্দির, দেওয়াল তৈরি হয়। বাংলার পোড়ামাটির শিল্প বা টেরাকোটার শিল্প তো জগৎ বিখ্যাত। সিন্ধু সভ্যতার কালে, বেদের যুগেও মৃৎশিল্পের সন্ধান মেলে। মানুষ শুধু কাদামাটি দিয়ে হাতেই এমন মূর্তি গড়ে পরে রোদে শুকিয়েছে। আগুনে পুড়িয়েছে। মূর্তি স্থায়িত্ব পেয়েছে। প্রাচীনকালেই মানুষ হয়েছেন শিল্পী। সেই পুরাতনী মানুষ এমন শিল্প সাধনাকে অবলম্বন করে সভ্যতার পথে এগিয়েছে। মানুষের মানুষ হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে। মানুষ হেঁটেছে। গৃহস্থালী মাটির শিল্পে, পোড়ামাটির শিল্পে মানুষের প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যবোধ পূর্ণতা লাভ করেছে। মাটির শিল্পের অলংকরণ শিল্পীর অন্তরস্থিত সৌন্দর্য সত্তার প্রকাশ। মধ্যযুগে গ্রাম প্রতিষ্ঠার পর মৃৎশিল্প মানুষের জীবন জীবিকা অর্থনীতির বাহক। গ্রামেই ছিল কুমোরপাড়া। পল্লী কুমোরেরা শত শত বৎসর ধরে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে মৃৎশিল্পের সৃষ্টি কৌশল আয়ত্ত করেছেন। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে আদর্শ গ্রাম সমাজ গঠনে কুমোরদের ভূমিকা সবিশেষ

উল্লেখযোগ্য। গ্রামের হাটে পল্লী কুমোরেরা তাদের শিল্পবস্তু বিক্রি করেছেন। গ্রামের অর্থনীতি সচল থেকেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবস্তু মৃৎশিল্পেই প্রাণিত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি যে কেবল পার্থিব বস্তু নয়, তার বিরাট মহিমান্বিত আধ্যাত্মিক সত্তা রয়েছে, মৃৎশিল্পের অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে তা ধরা পড়ে। মৃৎশিল্পের মধ্যে ভারতীয় পুরাণ, আধ্যাত্মিকতা, শত শত বৎসরের পালিত ধর্মবোধ, দেববাদ এবং আচারের পরিশীলিত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। জাতিগঠনে মৃৎশিল্পীদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বাংলাদেশের কুমোরেরা প্রাচীন শিল্পীকুল। একান্তই পল্লী-কুমোরেরা শত শত বছর ধরে মাটির শিল্প তৈরি করে এসেছেন। তাদের সৃষ্ট শিল্প শুধু প্রয়োজন পূরণ করে না, তা মানুষের রূপসন্ধানী, সৌন্দর্য সন্ধানী চিত্তকে ছুঁয়ে যায়। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার তাদের সৃষ্টিকর্মের মূল। George C.M. Birdwood তাঁর 'The Arts of India' গ্রন্থের 'Pottery' অংশে লিখেছেন - " I have gone thus fully into the Indian village Potter's surroundings and antecedents because it is only by a chronological and historical reduction and a right knowledge of its economical conditions that we can get at all profitably at the original of an art". (১)

মৃৎশিল্প মানব সভ্যতার ইতিহাসে গড়ে ওঠা প্রাচীনতম শিল্প। কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Handicrafts of India' গ্রন্থে লিখেছেন - " Clay craft is probably the earliest of man's creations and kind of marks his coming of age." (২)

সংস্কৃত-সভ্য মানুষের প্রাচীন শিল্প মৃৎশিল্প। জল ছাড়া মানুষ বাঁচে না। প্রয়োজন জল ধারণের পাত্র। সুতরাং মানুষের জীবনযাপনের প্রাথমিক উপকরণ জলপাত্র। কলসী, ঘড়া, মাটির ভাঁড়, ঘট, কুম্ভ, ভৃঙ্গার, খাপরা প্রভৃতি শিল্প হল লোকশিল্প। শ্রী অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'মৃৎশিল্প' প্রবন্ধে লিখেছেন – "এই জন্য মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিহাসে, আদিম শিল্পী হল – মাটির ঘটি-বাটি গড়তে কুশল, মৃৎশিল্পী, কুম্ভকার, কুমোর"। (৩)

নিম্নবর্গের মানুষেরা ছিলেন শিল্পী। কুমোরপাড়ার কুমোরেরা মাটির জিনিস তৈরি করার জন্য শুধু নিজেদের হাত এবং পরবর্তীকালে চাকার ব্যবহার করেছেন। কুমোরেরা

মাটি সংগ্রহ করে, মাটিকে থেসে উপযুক্ত করে, হাত বা চাকের সাহায্যে পাত্র তৈরি করে তাকে বিভিন্ন অবয়বে সম্পূর্ণ করেন। এরপর রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মাটির শিল্প তৈরি করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই শিল্পীরা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। শিল্পকে অলংকৃত করেন কুমোরেরা। মৃৎশিল্প অপরূপ সৌন্দর্যে চিরন্তন হয়ে ওঠে। মাটির জিনিস পোড়ানোর ফলে এমন আকার প্রাপ্ত হয় যে, জলে বা আগুনেও তা নষ্ট হয় না, তা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। কনক রায় তাঁর 'মৃৎশিল্পের কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন – "মাটির শিল্প সভ্যতার গোড়ার কথা। সভ্যতার মধ্যযুগের সঙ্গেও যে মাটির শিল্পের যোগ সামান্য নয়, মৃৎশিল্প নিজেই তার পরিচয় দিচ্ছে। সভ্যতার শেষের কথা যদি কোনও দিন লেখা হয়, তবে হয়তো তার ভিতরেও ধরা পড়বে এই মৃৎশিল্পের কাহিনিই। অনেক সভ্যতা যা আজ পৃথিবীর বুক হতে লুপ্ত হয়ে গেছে, মৃৎশিল্পই তাদের গৌরবের ইতিহাস গড়ে তুলেছে আগত ও অনাগতদের সামনে"।[৪]

মৃৎশিল্পে নানা চিত্র অঙ্কন করা হয়। নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, প্রতীক, রীতিনীতি ও আচার, সংস্কার মৃৎশিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মৃৎশিল্পে নানা ফুল, লতাপাতা, জীবজন্তুর মূর্তি অঙ্কন করা হয়। এছাড়া দেবদেবীর পূজা অর্চনায় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মাটির জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়। পুজোতে ঘটের প্রতীক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঘট পূজা করা হয়। এছাড়া মাটির প্রতিমা লোকায়ত শিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ দান।

এককথায়, বাংলার মৃৎশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি হল – কলসী এবং পাত্র, পুতুল, দেবদেবীর মূর্তি এবং ইট প্রভৃতি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মৃৎশিল্পের উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিতভাবে –

[নিম্নোক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [৫]

ক) <u>ঘড়া:</u>

১) ঘড়া (কলসী, পৃ: ৬৭ – ৫ বার উল্লিখিত), ২) ঘড়া (কলসী, পৃ: ৬৭), ৩) ঘড়া (কলসী, পৃ: ১২১) ৪) ঘড়া (পৃ: ১২৯), ৫) ঘড়া (কলসী, পৃ: ২৫৩), ৬) ঘড়া (কলসী, পৃ: ৩০০)

খ) কলসী:

১) কলসী (পৃ: ৬৫), ২) কলস (পৃ: ২৮০)

গ) ঘট:

১) ঘট (পৃ: ১২২), ২) ঘট (পৃ: ১৯৮), ৩) ঘট (পৃ: ১৯৯), ৪) ঘট (পৃ: ২০২)।

ঘ) হাঁড়ি:

১) হাঁড়ি (পৃ: ৪৫, ২ বার উল্লিখিত), ২) হাঁড়ি (পৃ: ৪৬), ৩) হাঁড়ি কুড়ি (পৃ: ৮২), ৪) হাঁড়ি (পৃ: ৮৪), ৫) হাঁড়ি (পৃ: ১৫৮), ৬) হান্ডি (হাঁড়ি, পৃ: ৪৫)।

ঙ) ভৃঙ্গার:

১) ভৃঙ্গার (জলপাত্র, পৃ: ১৫৬)

চ) মাটির পাত্র:

১) মাটিয়া পাথরা (মাটির পাত্র, পৃ: ৪৫), ২) মাটিয়া পাথরা (মাটির পাত্র, পৃ: ৬২, ২-বার উল্লিখিত)।

ছ) হাঁড়ির মুখের সরা:

১) সরা (পৃ: ৪২)

জ) পাট:

১) পাট (গোলাকার বড় মৃৎপাত্র, পৃ: ১২১)।

ঝ) খাপরা:

১) খাপরা (পৃ: ৪৫)।

ঞ) প্রতিমা:

১) প্রতিমা (মাটির ঠাকুরের মূর্তি, পৃ: ৭২), ২) প্রতিমা (মাটির ঠাকুরের মূর্তি, পৃ: ১২৩)।

ট) ভাণ্ড:

১) ভাণ্ড (ভাঁড়, পৃ: ৭৯)

ঠ) ইট:

১) ইট (পৃ: ৭২)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে 'সাত ঘড়া ধন' –এর উল্লেখ রয়েছে। 'লোহার শিকলে ছিল সাত ঘড়া ধন'(পৃ: ৬৫)। আবার বণিক খণ্ডে 'গছে বান্ধ্যা নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া' (পৃ: ৩০০)। কবিকঙ্কণের কাব্যে ঘটের উল্লেখও এসেছে বেশ কয়েকবার। ঘট শুধু মৃত্তিকা নির্মিত কলসী নয়। ভারতীয় পুরাণ, দেববাদ, আধ্যাত্মিকতা, অলৌকিকতা ঘটের উপর আরোপিত। ঘটে দেবদেবীর পূজার প্রচলন আছে। ঘট প্রতীকেই দেব দেবীর পূজা সম্পন্ন হয়। বিশেষত দেবী চণ্ডী এবং দেবী মনসা ঘট প্রতীকেই পূজিতা হন। ড. পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'পূজা পার্বণের উৎসকথা' প্রবন্ধে লিখেছেন – "ঘট প্রতীকে [....] পূজা হবার বিধিও সর্বজন বিদিত। [....] মাতৃকাদেবী (যেমন চণ্ডী)ঘটে পূজিতা হন। [....] মাতৃকাদেবীরা অনেক বেশি ' অ্যাবস্ট্রাক্ট' প্রতীক"। (৬)

সোনা, রূপা, তামা, কাঁসা প্রভৃতি ধাতুতে ঘট নির্মাণ করা হলেও মাটির ঘটই শ্রেষ্ঠ। ঘটকে মঙ্গলের প্রতীক মনে করা হয়। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁর 'দেবদেবী ও তাদের বাহন' গ্রন্থে লিখেছেন – 'দেবতার প্রথম আবাহন-মঙ্গল ঘটে। সুতরাং ঘটখানি সুদৃশ্য, শুদ্ধ এবং অক্ষত হওয়া প্রয়োজন। [...] মৃন্ময় ঘট সর্ব্বদাই প্রশস্ত। ঘটখানি জলপূর্ণ করতে হয়। জলই জীবন বা প্রাণ। জলে প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা। [...] সুতরাং ঘট বা কলস দেবশক্তিরই প্রতীক"। (৭)

সওদাগর ধনপতি দত্ত চণ্ডীর পূজার ঘটকে অবহেলা করেছেন। এবং বলেছেন –

'কেমন দেবতা বল পূজিস ঘট বারি

স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহী করি'। (৮)

কুপিত চণ্ডী সাধু ধনপতির সর্বনাশ সাধনে উদ্যত। তিনি ধনপতির ধ্বংস সাধন করতে চেয়েছেন এবং বলেছেন –

"মোর ঘট পায়ে ঠেলি দিআ জায় গালাগালি

সহে কেবা এত অপমান"। (৯)

সাধু ধনপতিকে দেবী চণ্ডী জলে ডোবাতে চেয়েছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'নহিলে আমার ঘট লঙ্ঘনের ফলে

ডুবাব সাধুরে আজি মগরার জলে"। (১০)

কুম্ভকার বা কুমোরেরাই হাঁড়ি কলসী তৈরি করেন। 'বাংলার মৃৎশিল্প' প্রবন্ধে শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন – " কুম্ভ হইতেই মৃৎশিল্পীর নাম কুম্ভকার হইয়াছে এবং পুত্তল-অনুশীলন ফলে-ধ্যানের ধারণানুযায়ী প্রতিমায় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে"। (১১)

কালকেতুর গুজরাট নগরীতে কুমোরেরা বসতি স্থাপন করেছেন। গড়ছেন হাঁড়ি-কুড়ি, মৃদঙ্গ-

"কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি কুঁড়ি গড়ে পিটে

মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া"। (১২)

বণিক খণ্ডে দুর্বলা দাসী হাট থেকে কেনেন আটা। কেনেন হাঁড়ি –

"দুবলা বেসাত্যে জানে অবশেষে হাঁড়ি কিনে

মাগ্যা লয় তার কিছু ভাট"। (১৩)

কবিকঙ্কণের কাব্যে ভৃঙ্গারের উল্লেখ আছে। লহনা খুল্লনার সর্বনাশ সাধনে রত। মন্ত্রপুত ঔষধ – জল ভৃঙ্গারে ভরে রেখেছেন – 'লহনা বিকল্প পানি পুরিআ ভৃঙ্গারে'। (১৪)

ব্যাধ জীবনের অবলম্বন সামান্য মাটির পাত্র। ফুল্লরা সামান্য মাটির পাত্রে কালকেতুকে ভোজন করতে দিয়েছেন – " সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা"। (১৫)

কবিকঙ্কণের কাব্যে মাটির প্রতিমার উল্লেখ আছে। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর 'বাঙ্গালার মৃৎশিল্প' প্রবন্ধে লিখেছেন – "বাঙ্গালার দেবদেবীর মূর্তি প্রধানত মৃত্তিকায় গঠিত হয়।

সে সকলের সৌন্দর্য দর্শক মাত্রকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। বাঙ্গালার কুম্ভকার প্রতিমায় যে 'দেবী মুখ' রচনা করিয়াছে, তাহাতে দিব্য সৌন্দর্য যেন প্রস্ফুটিত হইয়াছে"। (১৬)

কালকেতু দেবী চণ্ডীর জন্য মন্দির নির্মাণ করেছেন। নির্মাণ করেছেন প্রতিমা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'সুরম্য দীঘি-তট তাহাতে বিচিত্র মট

প্রতিমাদি করিল নির্মাণ"। (১৭)

বাংলাদেশে পাথরের বড় অভাব। এই অভাব পূর্ণ করে ইট। সেই সুদূর মধ্যযুগে কবিকঙ্কণের কাব্যে ইটের উল্লেখ এসেছে। শ্রী হেমেন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর 'বাঙ্গালার মৃৎশিল্প' প্রবন্ধে লিখেছেন – "বাঙ্গালায় পাথরের অভাব শিল্পীরা ইষ্টকের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিল। [....] বাঙ্গালার শিল্পীরা তেমনই এই সব ছাঁচে চালা ইষ্টকে নানা চিত্র ও নানা দৃশ্য দেখাইয়াছে। [....] এই শিল্প-ইষ্টকে কেবল যে নানারূপ পত্র, লতা, পদ্ম প্রভৃতি পুষ্প, রেখা, মূর্তি প্রভৃতি দেখা যাইত তাহাই নহে – পরন্তু ইষ্টকের পর ইষ্টক যেভাবে গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত হয় তাহাতে কোনও কোনও পৌরাণিক ঘটনা – রামায়ণের বা অন্য কোনও পুরাণের এক সুপরিচিত ঘটনা- চলচ্চিত্রের চিত্রের মত দেখা যায়। [.....] প্রধানত মন্দিরেই এই সকল ইষ্টক ব্যবহৃত হইত"। (১৮)

কবিকঙ্কণের কাব্যে কালকেতু দেবী চণ্ডীর দেউল নির্মাণ করেছেন। কুমোরেরা কাঠ এনে পুড়িয়ে নানা চিত্র সমৃদ্ধ ইট তৈরি করেছেন। এভাবেই লোকশিল্পীরা দেবী চণ্ডীর মন্দির গড়ে তুলেছেন। কবিকঙ্কণ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন –

"কাষ্ঠ আনি ভার বোঝা কুমার পোড়ায় পাঁজা

নানা ইট করএ নির্মাণ

নানা চিত্রে ইট কাটে দেউল হুদুরা মটে

সৌধময় কৈল পুরীখান"। (১৯)

শিল্প সৌন্দর্যের অধিকার মানুষের সহজাত অধিকার। কুমোরেরা মাটির কলসী তৈরি করেন। কলসীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় তাঁর

'Handicrafts of India' গ্রন্থে লিখেছেন - "One may say that the most unlettered of Potter's diplay an innate sense of aesthetic qualities. Basically they let the beauty of form have precedence over color and ornamentation so that the true artist in each can come out equally remarkable in their sense of colour." (২০)

দেবীপুরাণে কলসের উৎপত্তির পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, অমৃত রাখার জন্যই কলসের সৃষ্টি। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা দেবতাদের কলা অর্থাৎ অংশ অংশ নিয়ে এমন পাত্র নির্মাণ করেছেন বলে এর নাম কলস। দেবতারা কলসে অবস্থান করেন। দেবীপুরাণে বলা হয়েছে –

"কলাং কলাং গৃহীত্বা বৈ দেবানাং বিশ্বকম্মণা

নির্ম্মিতোহয়ং সুরৈর্যস্মাৎ কলসন্তেন উচ্যতে"। (২১)

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে যে ব্যক্তি অন্নের সঙ্গে জলপূর্ণ কলসী দান করেন তিনি সূর্যলোকে অবস্থান করবেন। শ্রী হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর 'স্মৃতি চিন্তামণি' গ্রন্থে লিখেছেন –

"যোহস্যাং দদাতি করকান্ বারিবাজসমন্বিতান্।

স যাতি পুরুষো বীর! লোকান্ বৈ হেমমালিনঃ"।(২২)

পুতুল: মানুষ যথার্থ মানুষ হতে চেয়েছে সেই আবহমান কাল থেকে। মানুষ সাধনা করেছে, করেছে তপস্যা। কবে যে এ সাধনা সম্পূর্ণ হবে, আমরা জানি না। পুতুল মানবসভ্যতার প্রাচীনতম শিল্পকলা। সংস্কৃতির পুরাতনী স্তরেই এই কলাশিল্পের সৃষ্টি। পুতুল শুধু শিশুর খেলনা নয়, পূজা-পার্বণে, মানতে, ছলন মূর্তিতে, মন্ত্র ও জাদু বিশ্বাসে, সংস্কৃতির নানা স্তরে যথা পুতুলনাচে, ঘর সাজানোতে, পুতুল প্রদর্শনীতে এবং মুখোশ মূর্তিতে এর ব্যবহার আছে। সাহিত্যে সাহিত্যিকেরা পুতুলকে নানা অর্থ তাৎপর্যে ব্যঞ্জিত করেন। পুতুলের প্রধান উপকরণ মাটি। কুম্ভকারদের তৈরী মাটির পুতুল ছাড়াও কাঠ, ধাতু, গালা, শোলা, ঝিনুক, মৃত পশুর হাড়, মোম, কাগজ, পাট, কাপড় প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যে পুতুল তৈরি হয়। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়েই পুতুলের ব্যবহার। সিন্ধু

সভ্যতার সময়ে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, এছাড়া প্রাচীন বাংলার তমলুক, বাঁকুড়া, চব্বিশ পরগণা এবং দিনাজপুর থেকে পুতুলের সন্ধান পাওয়া গেছে। লোকশিল্পের অনন্য উদাহরণ পোড়া মাটির পুতুল। হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, হাঁস, ময়ূর, টিয়ে প্রভৃতি কত না খেলনা পুতুল সেই আবহমান কাল থেকে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'খেলার পুতুল' প্রবন্ধে লিখেছেন—"খেলুড়ির রাজা হল মানব শিশু-নটরাজ সে নিজে নাচে বিশ্বকে নাচায়। [.....] ঘরের হেলা-ফেলার পুতুল,--যে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয় প্রাণ, যে মাটিতে মাটি হয়ে মেশে প্রাণের পাত্র দেহ, সেই মাটিতে গড়া হল পুতুল খেলার পুতুল। [.....] দূরে ডাকে পুতুলওয়ালা—খেলনা চাই, চুড়ি চাই—খুকি বার হল পরনে ডুরে শাড়ি খোঁপায় ফুল—যেন চলে পুতুলটি। খেলতে জানে সে পুতুল খেলা, শোলার খেলনা, চেনে তাকে পুতুল-ওলা। খোকাতে খুকিতে চলেন হাটে রাসের মেলায় খেলনা কিনতে"। [২৩]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পুতুলের ব্যবহার এসেছে। মাটির পুতুল ছাড়া ছবির পুতুল এবং কাঠের পুতুলের উল্লেখ আছে কাব্যে। পুতুলের নানা বৈচিত্র্য এবং সাহিত্যিক তাৎপর্যে ব্যবহার কাব্যকে অনন্য করে তুলেছে। 'আখেটিক খণ্ডে'র দেবখণ্ডে স্বয়ং গৌরী সন্তান কামনায় পুতুল নির্মাণ করেছেন। পুতুলের সঙ্গে এখানে প্রতীক, মোটিফ এবং জাদুর ভূমিকা আছে। সেই পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বয়ং দেবাদিদেব। হাতির মস্তক ছেদন করে পুতুলের মাথায় জুড়ে আপন সন্তান গণেশের জন্ম দিয়েছেন। গৌরী আপন অঙ্গের মল থেকে নির্মাণ করেছেন মনোহর পুতুল। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"এক এক মলি জুড়ি মনহর পুত্তলি

গৌরী নির্মাণ কৈল রঙ্গে"। [২৪]

শঙ্কর গৌরীর মনোবাসনা বুঝেছেন---

'পুত্র – আশা বুঝলাঙ পুতলি নির্মাণে'। [২৫]

পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন দেবাদিদেব—

"পুতলির কান্ধে মাথা জোড়াইল শিব

শিব – অঙ্গে পরসে পুতলি পাইল জীব”। [২৬]

বণিকখন্ডে খুল্লনাকে হারিয়ে সওদাগর ধনপতি দত্ত অস্থির – উদভ্রান্ত হয়েছেন। চেতনা শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। ঘরের খাটকে, প্রজ্জ্বলিত প্রদীপকে এবং ঘরের দেওয়ালে আঁকা চিত্র পুতুলকে তিনি খুল্লনার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন—

“চিত্রের পুত্তলি জত আছে গৃহ ভিতে

তারে নিবেদত্র সদাগর একচিত্তে”। [২৭]

মায়ের কাছে কন্যা চিরকালই পুতুল – খুঁকি থেকে গেছে। ননীর পুতুল কন্যাকে শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাতে হয়। সেই কন্যা খুল্লনাকে হারিয়ে মাতা রম্ভার বসন ভিজে যায় চোখের জলে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

“নুনির পুত্তলি ঝিয়ে আন্ধারের বাতি

হেন ঝিয়ে কেবা মোর মারে কিল লাথি”। [২৮]

পুতুলের সঙ্গে হিন্দু আচার সংস্কারের যোগ আছে। পুণ্যলগ্নে ধনপতি দত্ত সন্তান লাভ করেছেন। ব্রাহ্মণকে ধেনু দান করেছেন। আর খির পিঠালি তৈরি করে তার উপর সাতটি পুতুল রেখেছেন। শত শত বৎসর ধরে সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে সৌভাগ্যবান পিতা এমন মঙ্গল-সংস্কার পালন করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

“খির তিল পিঠালিতে করিআ মণ্ডলী

তথি পরে থুয়্যা জায় সাতটী পুত্তলি”। [২৯]

মৃত্যু সম্পর্কিত সংস্কার পালনে, পরলোকের কর্মে পুতুলের ব্যবহার করা হয় কুশের মাধ্যমে। শ্রীমন্ত পিতার খোঁজে সুদূর সিংহল যাত্রা করছেন। মাতা খুল্লনাকে প্রবোধ দিচ্ছেন, যদি পিতাকে না খুঁজে পান, যদি পিতার মৃত্যু হয়, তবে—

“আসিয়া আপন দেশে পুত্তলি করিআ কুশে

করিব পিতার পরিত্রাণে”। [৩০]

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য শেষ হচ্ছে গভীর বিষণ্ণতায়। পৃথিবীর নাট্যশালায় খুল্লনা এবং ধনপতি দত্তের অভিনয় শেষ হয়েছে। কেউ যেন অদৃশ্যে থেকে কাঠের পুতুলের মত আমাদের নাচিয়েছেন। কাব্যের নায়ক নায়িকা পৃথিবীর রঙ্গশালা শূন্য করে স্বর্গে চলে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ 'শাজাহান' কবিতায় লিখেছেন—

"জীবন উৎসব শেষে দুই পায়ে ফেলে

মৃতপাত্রের মত যাও চলে"। [৩১]

শেক্সপীয়র বলেছেন, পৃথিবী একটি নাট্যশালা, আমরা অভিনয় করি মাত্র। আমাদের কবিকঙ্কণ কাঠের পুতুলের নাচানোর উপমায় এই মর্ত্য পৃথিবীতে জীবন মৃত্যুর খেলাঘরকে দ্যোতিত করলেন—

"খিতিতলে উৎপতি খতিতালে মৃতি

বাদিআ নাচায় জেন কাষ্ঠের পুত্তলী

সেইরূপ সংসারনাচে কৃষ্ণ করে কেলী

মনেতে ভাবিআ দেখ কেহ কার নয়

পথিকে পথিকে জেন পথে পরিচয়"। [৩২]

মাটির পুতুল তৈরি করেন কুমোরেরা, কাঠের পুতুল ছুতোরেরা। কিন্তু পুতুল কেন্দ্রিক আর এক বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের সন্ধান মেলে। ডাণ্ডের পুতুল, সুতোয় টানা পুতুল, দস্তানা পুতুল নাচিয়ে সম্প্রদায়ের শিল্পীদের দেখা মেলা ভার। কিন্তু একসময় বেশিরভাগ ব্রাত্য অপাংক্তেয়, তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পীরা সমাজে পুতুল নাচিয়েই সম্মান পেতেন। যদিও, সমাজ পরিচালনায় তাদের তেমন ভূমিকা ছিল না। দার্শনিক ভাবনায়, এ সংসারে মানুষও এক রকমের পুতুল। অদৃশ্য থেকে তাকে কেউ নাচাচ্ছে। পুতুল সমাজ, সংসার, ব্যক্তির জীবন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে নানাভাবে ভূমিকা পালন করেছে। রূপক এবং প্রতীক তাৎপর্যে সাহিত্যিকেরা পুতুলকে ব্যবহার করে সাহিত্যকে যথার্থ সাহিত্য হতে সাহায্য করেছে। 'পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ' গ্রন্থে শ্রীসনৎকুমার মিত্র লিখেছেন—"কি শিশুক্রীড়ার পুতুল, কি পুতুলবাজির পুতুল সর্বত্রই কল্পিত এবং প্রত্যক্ষ

উভয়শ্রেণীরই পুতুল দেখা যায় বা তৈরি হয়ে থাকে। এবং এই পুতুল নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বকালেই সব অংশের মানুষই যুগ-কাল-সম্প্রদায়ও গোষ্ঠীগত ভাবনা ও বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়েছে। আপনাপন শিল্পজ্ঞানকে প্রয়োগ করেছে"। [৩৩]

প্রদীপ: আগুন আবিষ্কার সভ্যতার এক বড় বিস্ময়। মানুষ পরবর্তীকালে অগ্নিদেবতার কল্পনা করেছেন। কালভেদে-সমাজভেদে এবং দেশভেদে আগুনকে কেন্দ্র করে সংস্কার-বিশ্বাস এবং নানা রীতি-নীতি গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে আগুনের শীলিত মঙ্গলরূপের প্রতীক প্রদীপ। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁর "ভারতসংস্কৃতির উৎসধারা" গ্রন্থে লিখেছেন—"ধর্মোৎসবে অথবা কোন শুভকার্যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখা অনেক সভ্য জাতির মধ্যে বর্তমান। এইরূপ প্রদীপ হঠাৎ নির্বাপিত হইলে উহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া সেই সকল জাতি মনে করে। হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ ধারণা বিশেষ বদ্ধমূল। [৩৪]

প্রদীপ মাটি, পিতল এবং কাঁসার তৈরি হতে পারে। মাটির প্রদীপ কুমোরেরা তৈরি করেন। পিতল এবং কাঁসার প্রদীপ তৈরি করেন ডোকরা কামারেরা। প্রদীপ নির্মাণে ব্রাত্য লোকশিল্পীরা আশ্চর্য শিল্প-সৌন্দর্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। মাটির শিল্পের রূপসৌন্দর্য স্বর্গের অপরূপত্বকেও যেন ছাপিয়ে যায়। আর ডোকরা কামারেরা সমাজের একান্তই অন্ত্যজ থেকে গেছেন চিরকাল। ব্রাহ্মণ্য রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেও বেঁচে বর্তে থাকার তাগিদে শিল্প রচনা করেছেন। নানা আঙ্গিকের পিতল কিংবা কাঁসার প্রদীপ তৈরি করেছেন। কুমোরের চাকে শিল্পীর হাতে দগদগে ক্ষত, আর ডোকরা কামারদের মোমের আগুনে পুড়ে যায় আঙুল। এমন জীবন যন্ত্রণাকে পাথেয় করেও অক্ষরজ্ঞানহীন ব্রাত্য মানুষেরা হয়ে ওঠেন শিল্পী। Jean Chevalier এবং Alain Gheerbrant সম্পাদিত গ্রন্থে প্রদীপের প্রতীক সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"Lamp symbolism is linked to that of the diffusion of light. [.....] Even in the west, the lamp is sometimes taken as a symbol of holiness and the contemplative life. [.....] in the Upanishads, [.....] the lamp a symbol of the Divine Spirit or the world soul." [৩৫]

কবিকঙ্কণের কাব্যে প্রদীপ এসেছে। আখেটিক খণ্ড এবং বণিক খণ্ডে প্রদীপের ব্যবহার নিম্নরূপ—

১) দীপ (পৃ: ২) ২) দীপ (পৃ: ৫) ৩) দীপ (পৃ: ২০) ৪) দীপপাত্র (পৃ: ২০) ৫) দেউটি (প্রদীপ, পৃ: ২১) ৬) দেউটি (পৃ: ৪৩) ৭) পঞ্চদীপ (পৃ: ৮২) ৮) দীপ (পৃ: ৮৭) ৯) প্রদীপ (পৃ: ১০৩) ১০) প্রদীপ (পৃ: ১২৩, ২ বার উল্লিখিত) ১১) প্রদীপ (পৃ: ১৩৫) ১২) প্রদীপ (পৃ: ১৩৬) ১৩) দীপ (পৃ: ১৪৭) ১৪) দীপ (পৃ: ১৬১) ১৫) প্রদীপ (পৃ: ১৬৫) ১৬) দীপ (পৃ: ১৭২) ১৭) দীপ (পৃ: ১৭৯) ১৮) দীপ (পৃ: ২৯৭)

[উপরিলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থে নির্দিষ্ট]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবদেবীর বন্দনার সাথে সাথে চৈতন্য বন্দনাও কাব্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব মঙ্গল দীপ স্বরূপ—

"মহা কলি-অন্ধকারে চৈতন্য অবতারে

প্রকাশিলা হরিনামদীপ"। [৩৭]

দেবী চণ্ডীর পূজায় মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়—

"বলি হোম ধূপদীপে তোমা পূজে সপ্তদ্বীপে

তোমার সেবক জগজন"। [৩৮]

দেবখণ্ডে হরগৌরীর বিবাহ মঙ্গল উৎসবে জ্বলছে দীপ—'চৌদিগে জালেন দীপমালা'। [৩৯]

মঙ্গলসূত্র এবং অধিবাসে জ্বলছে দীপ—

"প্রমথ পাছে ধায় চলিলা দেবরায়

দেউটী ধরে দানাগণ"। [৪০]

অনার্য বিবাহের অধিবাস এবং মঙ্গল অনুষ্ঠানেও দীপ জ্বলে। কালকেতু ফুল্লরার বিবাহে জ্বলেছে দীপ—

"চৌদিকে দেউটি জলে বসিল কুঞ্জর-ছালে

বন্ধুজন মেলি কুতূহলে"। [৪১]

কালকেতুর স্বপ্নের গুজরাট নগরে নানা বৃত্তিজীবী শিল্পী সম্প্রদায়ের সমাগম। কাঁসারি কাঁসা দিয়ে গড়েছে পিতলের পঞ্চদীপ—

"কাঁসারি পাতিয়া শাল

.....

সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ"। [৪২]

সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানো বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ। গুজরাট নগরে প্রতিঘরে জ্বলছে প্রদীপ—

"প্রতিঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপ জ্বলে

শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বেনি"। [৪৩]

বণিক খণ্ডে খুল্লনা এবং ধনপতি দত্তের মঙ্গল বিবাহে প্রতিমা পূজায় জ্বলেছে প্রদীপ—

"সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ ভুবনে উপমা-রঙ্ক

পূর্ণপাত্র প্রিদিপ সহিত"। [৪৪]

ওষুধি তৈরিতে, মন্ত্রে এবং সংস্কারে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়—

"কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি

দুর্গা প্রদীপ পুত্যা রাখিয়াছে চেড়ি"। [৪৫]

মন্ত্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে খুল্লনার অনিষ্ট করার কারণে প্রদীপের আধ্যাত্মিক শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন লহনা—

"পত্রিকার কলাগাছ রূপিবে অঙ্গনে

ঘৃতের প্রদীপ তথি দিবে প্রতিদিনে"। [৪৬]

মন্ত্রশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে কালিয়া বিড়াল, শকুন-শকুনির হাড়, ভুজঙ্গের ছাল এবং নেউলের অণ্ড দিয়ে অনিষ্টকারী ওষুধ প্রস্তুত করা হয়—

"আনিবে রাই সরিসা শুষুকের তৈলে

ঘৃতের প্রদীপ জালি ভুঁজিবে কুতূহলে"। [৪৭]

খুল্লনা চণ্ডীপূজা করছেন, জ্বলেছে দীপ—

"অক্ষত মালা দীপ

চন্দন দিল ধূপ"। [৪৮]

বাসঘরে দীপ জ্বালানোর রীতি আছে। ধনপতি এবং খুল্লনার শয়ন কক্ষে জ্বলেছে দীপ—

"চৌদিকে উচ্ছ্রিত স্থলে মণিময় দীপ জ্বলে

জেন দেখি ইন্দ্রের ভবন"। [৪৯]

প্রদীপের চমৎকার সাহিত্যিক দ্যোতনা এনেছেন কবি। লিখেছেন—

"যৌবনে নারীর মান উদকে নৌকার যান

নিশাকালে দীপের আদর"। [৫০]

শ্রাদ্ধে, উপনয়নে ব্রাহ্মণেরা প্রদীপ জ্বালিয়ে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন—

"পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপে গন্ধ গঙ্গাজল শিপে

দান করে কনক আসন"। [৫১]

খুল্লনাকে হারিয়ে অস্থির হয়েছেন ধনপতি। প্রদীপকে সজীব পদার্থ বলে মনে করেছেন—

"কহ না প্রদীপ মোরে কোথা সহচরী"। [৫২]

মধ্যযুগে নারীর অবস্থান ছিল মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত। কন্যা মাতার কাছে বেঁচে থাকার আশ্রয়। আলোকিত দীপের মত। বিবাহের পর কন্যাকে অন্যের সংসারে চলে যেতে হয়। ব্যথিত, অশ্রু সজল হয়ে ওঠেন মাতা। দীপ মায়ের কাছে আঁধার ঘরের আলো—

"আন্ধার ঘরের দীপ জাবে ঝিত্র আর দ্বীপ

লুপ্ত হইল দরশন"। [৫৩]

সেকালে মায়েরা তুলসীতলায় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করতেন। জীবনের প্রতিটি শুভ অনুষ্ঠানে সেকালে মঙ্গল দীপ জ্বালানোই সাধারণ রেওয়াজ ছিল। সময়ের সাথে সাথে সে সব বিশ্বাস সংস্কার কমে এসেছে। মাটির প্রদীপও একালে হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলার লোকশিল্প-ভারতীয় জীবনবোধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্ক যুক্ত। ধর্ম ভারতীয় সমাজ এবং জীবনের দীপাধার। বাংলার লোকশিল্পে স্বাভাবিকভাবে এসেছে মিথ বা পুরাণভাবনা। মোক্ষ এবং মুক্তির ইচ্ছা, বেদের প্রভাব বাংলার লোকশিল্পের অন্তরস্থিত শক্তি। Stella Kramrisch তাঁর 'The Art India' গ্রন্থে লিখেছেন—

In India, the ultimate aim of life is Release (moksa), and art is one means of attaining this aim. [.....] In this art, the shape of man and all subsidiary figures are ordered in accordance with a living myth. They serve as its symbols and carry out its rhythms. [.....] The craftsman, his patron and the public for whom he makes the work of art are magically one, and this relationship is further supported by the fact that the craftsman is a link in the unbroken chain of the Tradition। [৫৪]

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূর্ব পুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণের উল্লেখ আছে। কিছুকাল আগে আকাশে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের রীতি ছিল। কার্তিক মাসে আকাশে প্রদীপ জ্বেলে মৃত পূর্ব পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখনো হত। হিন্দু সংস্কার এবং বিশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় প্রথাটিতে। মৃত পূর্ব পুরুষদের

স্বর্গ থেকে মর্ত্যের পথ দেখানো হত এভাবে। আকাশে প্রদীপ জ্বালার মধ্য থেকে স্বর্গীয় পূর্ব পুরুষদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। হিন্দু সমাজে এসব রীতি-নীতি আর পালিত হয় না। শ্যামা পূজার রাতে আর সারি সারি প্রদীপ জ্বালানো হয় না। এসব আজ একান্তই স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথ 'আকাশপ্রদীপ' কবিতায় লিখেছেন—

"এবার তবে ঘরের প্রদীপ

বাইরে নিয়ে চলো।

.....

অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ-পানে—

যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে"। [৫৫]

মৃৎশিল্প আজো বেঁচে আছে। তবে তাতে পড়েছে কালের প্রলেপ। ভেঙে গেছে গ্রাম বাংলায় কুমোরদের যুথবদ্ধ গোষ্ঠী জীবন। কিন্তু ষোড়শ শতকের কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম সমাজে এই ব্রাত্য শিল্পী সম্প্রদায় জীবন্ত ছিলেন। সম্প্রদায় এবং বৃত্তি শিল্প সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা শিল্প সৃষ্টির সহায়ক। শিল্পীদের উত্তরাধিকার তাদের পুষ্ট করেছিল। বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পীকুল কুমোরদের সামাজিক অবস্থান এবং তাদের শিল্পকাজ সম্পর্কে R.V. Russell তাঁর "The Tribes and Castes of the Central provinces of India, Volume I" গ্রন্থে লিখেছেন- "The Kumhar or potter is now not paid regularly by dues from the cultivators like other village menials, as the ordinary system of sale has been found to be more convenient in his case. But he sometimes takes for use the soiled grass from the stalls of the cattle and gives pots free to the cultivator in exchange. [.....] The Hathgarhia Kumhars (potters) are those who used to fashion the clay with their own hands, and the Chakarias

those who turned it on a wheel. And though the practice of hand pottery is now abandoned, the divisions remain.[৫৬]

শিল্পীরা দেশকালের সন্তান। কুমোরেরাও। মৃৎশিল্প মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণ করেছে। তারপরে শিল্পীরা তাদের সৃষ্ট শিল্পে রেখে গেছেন সমাজ – সভ্যতা – সংস্কৃতির নানা চিহ্ন। সমকাল নানা অলংকরণে রূপ পিপাসু, সৌন্দর্য সন্ধানী মৃৎশিল্পীদের সৃষ্ট শিল্পে শিল্প চিহ্ন নিয়ে ধরা পড়েছে। পূজা-অর্চনার জন্য যে সব মৃৎশিল্প সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে শিল্পীরা এঁকেছেন নানা দেবদেবীর মূর্তি। নানা মোটিফ, চিত্র-প্রতীক শিল্পীরা এঁকেছেন। ধর্মপ্রাণ বাঙালি পুরাণ আশ্রিত মৃৎশিল্প তৈরি করেছেন। আদিম শিল্পীরা যেমন প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য গর্ভবতী রমণীর চিত্র অঙ্কন করেছেন, অনুরূপে বাঙালির সৃষ্ট মৃৎশিল্পে সমাজ সমকালের নানা মোটিফ ফুটে উঠেছে। মানুষের সৌন্দর্যতৃষ্ণা একই আধারে রূপ লাভ করেছে। প্রকৃতি নিসর্গের নানা চিত্র মৃৎশিল্পে স্থায়ী বিশেষত্ব রেখে গেছে। 'Dictionary of Symbols' গ্রন্থে 'Pot' সম্পর্কে বলা হয়েছে – "The Vessels shaped by the potter are the elements of our Karma, [....]. A more general attribution is that current in India, where the pot is a water and especially a female symbol. In some cults of Dravidian origin, the goddess herself is represented by a pot. In classical iconography a cosmetics jar is a typical attribute of Devi. The pot Dance was an extremely ancient fertility rite which displayed the utensil's sexual symbolism. [৫৭]

বাংলার মৃৎশিল্পে পোড়ামাটির শিল্প এক বিশেষ বিশেষত্ব নিয়ে এসেছে। স্থানিকতা এবং আঞ্চলিকতা এই শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলার পোড়ামাটির শিল্প কালজয়ী। Saifuddin Chowdhury তাঁর 'Aspects of material and Folk culture in Bangladesh' গ্রন্থে লিখেছেন – "The study of terracotta art in Bangladesh should not only include a discussion in historical perspective and the aesthetic appraisal

of discovered materials. [...] Some of the clay figurines were also made on the potters wheel. The technique became very popular in the post-Gupta period at Ahichchhatra. In such cases, the cylindrical hollow body of a figurine was made on potters wheel. The hands, legs and ornaments in such figures were however, hand modelled. [৫৮]

মৃৎশিল্পের চিহ্ন পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতায়। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতে মাটির ভাঁড় পাওয়া গেছে। ঋগ্বেদে মৃৎশিল্পের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে (১০/৭২/২) 'কর্মার' শব্দটির উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের বিশ্লেষকরা মনে করেন, বেদের যুগে মূর্তি গড়ার জন্য একটি বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল। এরা পুতুল বা মূর্তি গড়তেন। এরা ব্রহ্মণস্পতি কর্মারের ন্যায় দেবতাদের নির্মাণ করছেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় বৈদিক ঋষি বলেছেন –

"ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্মার ইবাধমৎ।

দেবানাং পূর্ব্যে যুগেহসতঃ সদজায়ত"। [৫৯]

মধ্যযুগের কৃষিভিত্তিক সমাজের সেই শিল্পকলাকে একালে আর সেভাবে পাওয়া যাবে না। যথার্থ শিল্পীর অভাবে শিল্পের সেই নান্দনিকতা গেছে হারিয়ে। সায়েন্স এবং টেক্‌নোলজির প্রভাব, স্টীল, কাঁচ, ফাইবার এবং যন্ত্রযুগের প্রসারে মৃৎশিল্পীরা হারিয়ে যাচ্ছেন। শিল্পীরা ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ভেঙে গেছে মধ্যযুগের স্বয়ং সম্পূর্ণ পল্লী। একাল মৃৎশিল্পের অবশেষ ঘোষণা করেছে। মৃৎশিল্প এবং শিল্পীরা আজ সংকটের মুখে। মৃৎশিল্প হয়তো রূপকথার মত দেড়শো দুশো বছর পরে জাদুঘরে জায়গা নেবে। লোকজ্ঞানের অভিজ্ঞতাই মৃৎশিল্পের নান্দনিকতার মূলে। মনে করা হয়, সভ্যতা যখন সদ্য বিকশিত হচ্ছে, তখন থেকে মৃৎশিল্পের সৃষ্টি হয়েছে। হরপ্পা ও মহেন-জো-দারো সভ্যতায় আবিষ্কৃত হয়েছে যে নানা আকৃতির মাটির ভাঁড়, সেগুলিতে গাছ লতাপাতার নানা নকশা আঁকা। মাটির ভাঁড় মানুষের জীবন ধারণের প্রথম উপকরণ। ভাঁড়

মানুষের জলপান করার পাত্র রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বোপরি শিল্পীর হাতে মাটির পুতুল কথা বলেছে। মাটির পাত্রের কারুকার্যে সৌন্দর্য অনুসন্ধানই প্রধান কথা। মৃৎশিল্পের শিল্প নিপুণতা বাঙালির জাতীয় শিল্প বৈশিষ্ট্যের একটি আশ্চর্য রীতি বললে অত্যুক্তি হয় না। কবিকঙ্কণের কাব্যে কুমোরেরা সেই সামন্ত্রতান্ত্রিক গ্রাম বাংলার একটি স্মরণীয় যুগের অধ্যায় রূপেই থেকে যাবে। তবুও সেই মধ্যযুগের ভারতবর্ষ। বিস্ময়ের ভারতবর্ষ। শিল্পের দেশ এই ভারতবর্ষ। A.L. Basham তাঁর 'The Wonder that was India' গ্রন্থের 'The Arts' অধ্যায়ের 'Terracottas' অংশে লিখেছেন – " Most are religious. Crude clay figures of goddesses – apparently early forms of Durga, worshipped by the lower classes before her inclusion in the orthodox pantheon – are common, [...] Other objects have little if any religious significance, though they have been charms or votive offerings, figures of mother and child, a type rare in sculpture, suggest offerings made by childless women, while the numerous figures of a man and woman [...] While many terracottas are crude, others are of fine workmanship and real beauty. Some faces are well characterized and divine heads are sometimes beautifully modelled. The terracotta plaques often have much charm. [৬০]

তথ্যসূত্র

১. Birdwood, George C.M.,The Art of India, C.S.I., MD Edin, British Book of Company, 3rd Edition – 1986, UK, P. – 320

২. Chattopadhyay, Kamaladevi, Handicrafts of India, India Council for Cultural Relations, First Published – 1975, Azad Bhavan, New Delhi, P. 3

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুকুমার, মৃৎশিল্প, প্রবাসী (পত্রিকা), চৈত্র ১৩৫০, সম্পাদক – কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ৪৯৭

৪. রায়, শ্রীকনক, মৃৎশিল্পের কথা, উদয়ন (পত্রিকা): দ্বিতীয় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা,কার্তিক – ১৩৪১, পৃ: ৮৪৩, সম্পাদক – অনিল কুমার দে

৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩,

৬. সেনগুপ্ত, পল্লব, পূজা পার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, মে, ১৯৯০, পৃ: ৯২

৭. নির্ম্মলানন্দ, স্বামী, দেবদেবী ও তাদের বাহন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কলকাতা, পৃ: ২৬-২৭

৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩,

৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৯

১০. পুর্বোক্ত, পৃ: ২০২

১১. ঘোষ, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ, বাংলার মৃৎশিল্প, মাসিক বসুমতী (পত্রিকা), ২১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ – ১৩৪৯, পৃ: ৪২৫, সম্পাদক – সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: - ৮২

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৮

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৬

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৭

১৬. ঘোষ, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ, বাংলার মৃৎশিল্প, মাসিক বসুমতী (পত্রিকা), ২১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ – ১৩৪৯, পৃ: ৪৩০, সম্পাদক – সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: - ৭২

১৮. ঘোষ, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ, বাংলার মৃৎশিল্প, মাসিক বসুমতী (পত্রিকা), ২১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ – ১৩৪৯, পৃ: ৪২৬, সম্পাদক – সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: - ৭২

২০. Chattopadhyay, Kamaladevi, Handicrafts of India, Indian Council for Culture Relations, First Published – 1975, Azad Bhavan, New Delhi , P. 97

২১. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পাদিত), দেবী পুরাণম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা , ১৪১৬, পৃ: ২৭৩

২২. সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিদাস, স্মৃতিচিন্তামণি, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ: ১৩

২৩. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, খেলার পুতুল, বঙ্গবাণী, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৩, পৃ: ৫১৬, সম্পাদক – বিজয়চন্দ্র মজুমদার

২৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: - ২৩

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৫

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪১

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৪

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৩

৩১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,শা-জাহান (কবিতা), বলাকা (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্ররচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্ম –জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ – ১৪০২, পৃ: ২৫৬

৩২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: - ৩১০

৩৩. মিত্র, শ্রীসনৎকুমার, পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ: ৮

৩৪. বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ, ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা, ড. সুশীলকুমার গুপ্ত সম্পাদিত, ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা, ভাদ্র – ১৩৭২, পৃ: ৮৩

৩৫. Chevalier, Jean, Gheerbrant Alain, ‘Lamp’, Dictionary of Symbols, Published by the Punguin Group, New York, USA, 1996, P. 589

৩৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: - ৭২

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ২

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ৫

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ২০

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ: ২১

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮২

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৩

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৩

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৫

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৬

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৭

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬১

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭২

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৯

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৫

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯৭

৫৪. Kramrisch , Stella, The Art of India, The phaidon press, 5 Cromwell Place, London, S.W. 7, 3rd Edition 1965, PP. 9-11

৫৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আকাশপ্রদীপ (কবিতা), আকাশপ্রদীপ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্ররচনাবলী (দ্বাদশখণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা – ১৭, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্ম – জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ – ১৪০২, পৃ: ৬১

৫৬. Russell, R.V. , The Tribes and Castes of The Central Provinces of India, Volume I, CPSIA, wwwJCGtesting.com, Printed in the USA PP. – xxx, xlix

৫৭. Chevalier, Jean and Gheerbrant, Alain, Dictionary of Symbols, Penguin Books, London, New York, 1996, P. 770

৫৮. Chowdhury, Saifuddin, Aspects of Material and Folk Culture in Bangladesh, Bangla Academy Dhaka, 2003, PP. 1,8

৫৯. দত্ত, রমেশচন্দ্র (সংকলিত), ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল), সদেশ, কলকাতা , ২০০৭, পৃ: ৬৮৬

৬০. Basham, A.L, The wonder that was India (The Arts, Terracottas), Picador, 2004, London, P. 375